একক ১৬ ❐ বাংলা ভাষার সংস্কার ও পরিকল্পনা

গঠন

১৬.১ উদ্দেশ্য

১৬.২ প্রস্তাবনা

১৬.৩ বাংলা ভাষা সংস্কার ও পরিকল্পনার নানা দিক

১৬.৪ লিপি সমস্যা ও সংস্কার

১৬.৫ বানান সমস্যা ও সংস্কার

১৬.৬ পরিভাষা নির্মাণ

১৬.৭ অভিধান ও উচ্চারণকোষ তৈরি

১৬.৮ প্রশাসনের ভাষা

১৬.৯ শিক্ষা ও মাতৃভাষা

১৬.১০ দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা

১৬.১১ বাংলা প্রাইমার রচনা

১৬.১২ সারাংশ

১৬.১৩ অনুশীলনী

১৬.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- বাংলা ভাষা পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকের কথা জানা যাবে।
- লিপি সমস্যা, বানান সমস্যা, পরিভাষা তৈরির সমস্যা, অভিধান রচনার সমস্যা প্রভৃতি সমস্যা এবং তার সমাধানের কথা জানতে পারা যাবে।
- প্রশাসনের ভাষা, শিক্ষার ভাষা প্রভৃতি বিষয়ও স্পষ্ট হবে।
- ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা নিয়ে ভাবনাচিন্তা যে থেমে নেই তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যাবে।

১৬.২ প্রস্তাবনা

উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে ভাষা সংক্রান্ত নানা সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের মতো বহু ভাষিক দেশে ইংরেজি ভাষার একটি প্রাধান্য দেখা যায়। আর তাই শিক্ষিত সচেতন বাংলাভাষী লোকের ক্ষেত্রে বাংলা। ভাষা যথাযথভাবে প্রয়োগ করার একটি সার্থকতা আছে। ভাষার নানারকম অসঙ্গতি ভাষা পরিকল্পনার মাধ্যমে দূর করা হয়। এই পরিকল্পনা এককভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে নিলে সার্থকতা পায় না। সার্থকতা পাবার ক্ষেত্রে প্রয়োজন দেশব্যাপী সার্বিকভাবে প্রয়োগ। এখানে ভাষা পরিকল্পনার সূত্র ধরে বাংলা ভাষার উন্নতি এবং সামঞ্জস্য বিধানের জন্য নেওয়া প্রস্তাব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৬.৩ বাংলা ভাষা সংস্কার ও পরিকল্পনার নানা দিক

বাংলা ভাষা নিয়ে ভাষা পরিকল্পনার কাজকর্ম নানা ব্যক্তি ও নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক দিন আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছে। যেমন, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার কমিটি বানান বিষয়ে নানা সুপারিশ করেছিলেন। আরও আগে ব্যক্তি হিসাবে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় মাতৃভাষা ও শিক্ষা নিয়ে উদয় চাঁদ আঢ্য-র প্রবন্ধ বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে ভাবনা চিন্তা আরম্ভ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি ভাষা পরিকল্পনার নানা কাজকর্ম করে চলেছে। এই সব কাজকর্মের ক্ষেত্রে সাহিত্য একাডেমির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ভাষা সমস্যা ও পরিকল্পনার কিছু নির্দশন দেওয়া হল।

গোপাল হালদার বাংলা ভাষা নিয়ে যেসব সমস্যার কথা বলেছেন তার মধ্যে দিয়ে যে যে বিষয়ে পরিকল্পনার প্রয়োজন তার একটি চিত্র পাওয়া যাবে 'বাঙালি ও বাংলা ভাষা' প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমির "প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা" গ্রন্থে মুদ্রিত]

প্রথমত, বাংলাভাষী লোকেদের নিরক্ষরতা দূর করা। কারণ, যতদিন তারা নিরক্ষর থাকবে ততদিন এ ভাষার উন্নতি অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মাতৃভাষা বাংলা। তাই উভয়ের মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, সমস্যাগুলিকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং তার সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।

চতুর্থত, সংস্কারের ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

এগুলি হল প্রাথমিক পরিকল্পনা। এর পর প্রধান সমস্যাগুলির কথা তিনি বলেছেন। সেগুলি হল—

ক. লিপি সমস্যা ও লিপি সংস্কার।

খ. বানান সমস্যা ও বানান সংস্কার।

গ. পরিভাষা নির্মাণ সমস্যা ও পরিভাষা নির্মাণ।

ঘ. অভিধান রচনা, উচ্চারণকোষ নির্মাণ প্রভৃতি কাজ।

১৬.৪ লিপি সমস্যা ও সংস্কার

বাংলা লিপির আসল চেহারা পুঁথিতে পাওয়া যাবে। বাংলা হরফের মুদ্রিত প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল হ্যালহেডের লেখা 'A grammar of the Bengal Language' (১৭৭৮) গ্রন্থে। চার্লস উইলফিন্‌সের নির্দেশে পঞ্চানন কর্মকার পুঁথির আদর্শে বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন। এটি লিপির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রথম সংস্কার। কিন্তু লিপির সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়নি।

শ্রীরামপুরে ১৮০১ থেকে মুদ্রিত নানা গ্রন্থে নানারকম লিপি পাওয়া যায়। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে মদনমোহন তর্কালঙ্কার শিশু শিক্ষা গ্রন্থে কিছু সংস্কার করেছিলেন। ১৮৫৫-৫৬ তে বিদ্যাসাগর কিছু লিপি সংস্কার করলেন।

হ্যালহেডের ব্যাকরণে বাংলা হরফে ৩৫৫টি রূপ পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর তা বাড়িয়ে করেছিলেন ৯৭৩টি। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবের ফলে ৫০৭টি রূপ পাওয়া যায়।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ১০ আগস্ট বাংলা একাডেমিতে লিপিসংস্কার বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাতে পবিত্র সরকার, প্রসূন দত্ত এবং অশোক মুখোপাধ্যায় একমত ছিলেন। ভিন্ন মত পোষণ করেন শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। গৃহীত সিদ্ধান্ত হল—

সিদ্ধান্ত ১-এ-কার, উ-কার, ঊ-কার, ও ঋ-ফলা সর্বত্রই একই রকম হবে। চিহ্নগুলি অক্ষরের নীচে বসবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ডানপাশে নীচের দিকে বসতে পারে। যথা- কু, শু, কৃ, রূ ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত ২-যে কোনো যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলির মূল চেহারা অবিকৃত থাকবে। তবে, আপাতত কেবল নীচের যুক্তাক্ষরগুলির প্রচলিত রূপ বজায় থাকবে। যথা ক্ষ, ক্ষ, ত্র, ভ্র, ষ্ণ, জ্ঞ, হ্ন, ত্ত, থ।

সিদ্ধান্ত ৩-পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছাপাখানা ও প্রকাশিত পুস্তকাদিতে ওপরের সিদ্ধান্তগুলিকে রূপদান করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হোক।

সিদ্ধান্ত ৪-প্রয়োজন বোধে ক্রু অক্ষরটি 'অ্যা' স্বর এর জন্য রাখা চলতে পারে। স্বরচিহ্ন হিসাবে থাকতে পারে। যথা, ক্রুসিড, কেলকুলেশন।

বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের পর প্রায় সাত বছর কেটে গেছে। সেভাবে লিপি সংস্কার সর্বত্র ঘটেনি।

১৬.৫ বানান সমস্যা ও সংস্কার

নানা কারণে বানানের অসঙ্গতি তৈরি হয়। অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষার শব্দসমূহও নানা ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে নেওয়া হয়েছে। বাংলার নিজস্ব শব্দভাণ্ডার দেশি শব্দগুলি। আর এই শব্দগুলির বানান মূলত উচ্চারণ অনুসারেই করা হয়েছে। তার বড়ো কারণ, বাংলাদেশি শব্দের লিখিত ঐতিহ্য দশম শতকের আগে অর্থাৎ বাংলা ভাষা উদ্ভবের আগে ছিল না। তাই সে সব শব্দের বানান নিয়ে তেমন সমস্যা নেই। সমস্যা তৈরি হয়েছে ধার করা শব্দগুলির ক্ষেত্রে।

বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড়ো ধার সংস্কৃত ভাষার কাছে। লিখিত সংস্কৃত বানানকে সোজাসুজি বাংলায় আনা হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত উচ্চারণ বজায় থাকেনি। বাংলা বর্ণমালায় বহু বর্ণ আছে যেগুলি বাংলায় উচ্চারিত

হয় না কিন্তু বানানে আছে। যেমন, 'যৎপরোনাস্তি'-র 'ইয়' কে উচ্চারণ করি 'জ'। আবার এমন স্বনিম আছে বাংলা বর্ণমালায় যা নেই। যেমন 'অ্যা' [একটা]। কিন্তু একটি ধ্বনি একটি প্রতীক এভাবে যদি বাংলা বর্ণমালার সংস্কার ঘটিয়ে উচ্চারণ অনুসারে বানান সংস্কার করা হয় তবে তা এক বিড়ম্বনা সৃষ্টি করবে। মোটামুটিভাবে বাংলা লিপিকে বজায় রেখেই বানান সংস্কার করতে হবে।

বাংলা বানান নিয়ে অনেকে মনে করেন, যেমন চলছে তেমনই চলুক। অনেকে মনে করেন মুখের উচ্চারণ অনুসারে বানান হোক। কারো মতে তৎসম শব্দকে মোটামুটি বজায় রেখে বাকিগুলিকে উচ্চারণ অনুসারে করতে হবে। ভাষা পরিকল্পনা প্রসঙ্গে শেষ দুটি মতবাদ নিয়েই আলোচনা দরকার।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত বাংলা আকাডেমির সুপারিশটি এখানে আলোচনা করা হল। উপসমিতির মূল বিশ্বাস ও নীতি ছিল—

ক. অভ্যস্ত সংস্কারের আমূল পরিবর্তন প্রচলনের সহায়ক হবে না।

খ. সীমাবদ্ধ এলাকায় ছোটো ছোটো সংস্কার বানান সরলীকরণে সাহায্য করবে।

■ তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে,

১. ই, ঈ, উ, ঊ এবং ই, ঈ, উ, ঊ কার বিকল্প যেসব বানানে আছে তার মধ্যে অধিকতর প্রচলিত বানানটি গ্রহণ করা।

২. ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাসবদ্ধ হলে হ্রস্ব-ইকার নিষ্প্রয়োজন। ফলে, শশিভূষণ, শশীভূষণ উভয় চলতে পারে।

৩. বাংলা প্রত্যয়যুক্ত হলেও মূল দীর্ঘ উ, দীর্ঘ ঈ চিহ্ন রক্ষিত হবে। যেমন নীলা।

৪. কালে শেষে হসন্ত দেবার দরকার নেই। বিস্বান।

৫. ক্রমশ, অনন্ত ইত্যাদি শব্দের পর বিসর্গ থাকবে না।

৬. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব সর্বত্র বর্জিত হবে। কার্তিক।

■ অর্ধ তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে,

১. মূলে দীর্ঘস্বর থাকলেও তা হ্রস্বস্বর হবে। পুজো।

২. ক্ষ, ক্ত, শব্দের প্রথমে হলে খ, গ, মাঝখানে ক, খ, গ্, গ দিয়ে লেখা চলবে। যেমন, খোওর, জিগ্‌গেস।

৩. মূলের ণ সর্বত্র দন্ত্য ন হবে। বরণ

৪. মূলের য ফলা বজায় থাকবে। ভাগ্যি।

৫. মূলের য, স, ষ যেখানে বদলে গেছে সেখানে ছাড়া অন্যত্র বজায় থাকবে। দস্যি।

■ তৎভব শব্দে

১. স্ত্রী বাচক শব্দের প্রত্যয় হ্রস্ব-ই-কার। ইনি, আনি, নি ও লেখা যায়

২. জাতি বাচক, ভাষাবাচক শব্দে হ্রস্ব-ই-কার। বাঙালি।

৩. সাধারণ বিশেষ্যপদে হ্রস্ব স্বরচিহ্ন গ্রাহ্য হবে।

৪. অর্থের জন্য ভারী-ভারি, কী-কি-র তফাত থাকবে।

৫. ছোটো, বড়ো লেখা যায়। ভালো, এগারো এসবও লেখা যাবে। কিন্তু কোন্-কোনো তফাত করতে হবে।

৬. ক্রিয়াপদে ঊর্ধ্বকমা ও অকারণ ও-কার বর্জনীয়। বল্, বল, বলো, বোলো, ইত্যাদি পার্থক্য প্রয়োজন।

৭. সময়বাচক শব্দে বা অন্যত্র নিশ্চয়ার্থক-ই বা -ও পৃথক রাখা উচিত। এখনই, এখনও

৮. ঐ-কার, ঔ-কার বিশ্লিষ্ট করে লিখতে হবে। খই বউ ইত্যাদি।

৯. সর্বত্র দন্ত্য-ন হবে।

১০. জাঁতি, জুঁই, জোগাড়, জোয়াল, জোড়া, জো, জোগান ইত্যাদি শব্দ ছাড়া শব্দের আদি য বজায় থাকবে। যখন।

১১. শ, স, ষ প্রচলিত বানান অনুসারে হবে। শিস।

■ **বিদেশি শব্দ**

১. হ্রস্ব স্বরচিহ্ন লেখা উচিত। সিট

২. আরবি বা ফারসি মূল শব্দের স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণ 'শ' হবে। যথা মাশুল প্রচলিত শব্দ ও ব্যক্তিনামে 'স' দেওয়া যেতে পারে। সুলতান।

৩. ইংরেজি শব্দে 'ষ্ট' থাকবে। পুরনো বঙ্গীকৃত ঋণ 'স্ট' থাকতে পারে। ইস্টিমার।

৪. কেবল দন্ত্য 'ন'-ই ব্যবহৃত হবে।

৫. শব্দের গোড়ায় যুক্তাক্ষর বজায় থাকবে। মাঝখানে ভাঙা সুবিধাজনক নয়।

বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাবগুলির সবগুলিই যে সমর্থনযোগ্য হয়ে উঠেছে বিদগ্ধ জনের কাছে সে কথা বলা যায় না। বিতর্ক আছে। তবে বাংলা আকাডেমির বানান অভিধান ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আমাদের আরও ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে একথা স্বীকার করা উচিত।

১৬.৬ পরিভাষা নির্মাণ

সংস্কৃত ভাষায় পরিভাষা বলতে সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা বোঝানো হয়। ইংরেজিতে বলা হয় টেকনিক্যাল শব্দ। ভাষা পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিভাষা তৈরি। বাংলা ভাষায় পরিভাষা তৈরির কাজ বিদেশিদের বাংলা ভাষা চর্চার সময় থেকে শুরু হয়েছিলা।

১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে পিটার ব্রেইন সংকলিত গ্রন্থে শারীর বিদ্যার ছশোর মতো পরিভাষা ছিল।

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত জন ম্যাক-এর 'প্রিনসিপলস অব রেজিষ্টি'-র বাংলা অনুবাদে রসায়ন শাস্ত্রের পরিভাষা পাওয়া যায়।

১৮৭৭ রাজেন্দ্রলাল মিত্রর 'এ স্কীম ফর রেন্ডারিং অব ইউরোপীয়ান সায়ান্টিফিক টার্মস্ ইন টু দ্য ভারনাকুলারস্ অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

১৮৯৪-১৯১৬ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পরিভাষা নিয়ে তাদের পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকে।

১৯০৭ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এ কেন্দ্রীয় সমিতির মাধ্যমে নানা শাস্ত্রের পরিভাষা ও শব্দ সংকলন করা হয়। ভাষাবিজ্ঞান সমিতি, পরিভাষা সমিতি ও শব্দ সমিতি মিলে কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হয়েছিল। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অস্থিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে পারিভাষিক শব্দ সংকলন করেছিলেন বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রদীপ, ভারতবর্ষ, ভারতী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, প্রভৃতিতে পরিভাষা নিয়ে বহু প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। এছাড়াও গ্রহণীয় —

যোগেন্দ্রনাথ রায় রচিত 'রত্নপরীক্ষা'

অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত 'পদার্থশিক্ষা'

নবীনচন্দ্র দত্ত রচিত'খগোল বিবরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা তৈরি করেছিল।

১৯৬০ ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও টেকনিক্যাল পরিভাষা তৈরির কমিশন গঠন করা হয়, 'Commision of Scientific and Technical Terminology' নামক কমিশন।

১৯৬৪ তে তারা বিজ্ঞান কার্যাবলি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১৯৮৫ তে বাংলা আকাডেমি পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করেন এবং সিদ্ধান্ত তৈরি করেন।

প্রকৃতপক্ষে পরিভাষা নিয়ে, তার সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে ভাবনাচিন্তা এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পর থেকেই আরম্ভ হয়ে গেছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী জানান যে, বিজ্ঞানের পরিভাষা প্রচলিত ভাষা থেকে আলাদা।

"একটি নির্দিষ্ট শব্দ নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে। সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করিবে না। এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের সৃষ্টি করিবে না, এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূলসূত্র।"

[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৮৯৪ খ্রিঃ]

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় অপূর্বচন্দ্র দত্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্মাণে সংস্কৃতজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানকে গুরুত্ব দেন। রামেন্দ্রকুমার ইংরেজি পরিভাষা বাংলায় অনুবাদ না করে অক্ষরান্তরিত করতে চেয়েছেন। যোগেশচন্দ্র রায়ও বিষয়টিকে সমর্থন করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের অযথা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করে পরিভাষা তৈরির প্রয়োজন কী—এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি লেখেন যে,

"যত কম পরিবর্তন করিয়া ইংরেজী নামগুলি গ্রহণ করিতে পারা যায়, তা বিষয়ে সর্বাগ্রে যত্নবান হওয়া উচিত।"

হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রবন্ধে বললেন,

ক. আমাদের দেশে প্রচলিত উপযুক্ত শব্দ গ্রহণ।

খ. নতুন শব্দ তৈরি।

গ. অন্যান্য দেশীয় বৈজ্ঞানিক শব্দে স্থানবিশেষে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ভাবে গ্রহণ।

ঘ. অন্যান্য জাতি যে সমস্ত শব্দ বা সাংকেতিক চিহ্ন কোন এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে তা কোথাও অক্ষরান্তরিত করে গ্রহণ ও কোথাও সরাসরি গ্রহণ।

রাসবিহারী মণ্ডল 'খনিজবিদ্যার পরিভাষা' (১৯২১) তৈরি করার ক্ষেত্রে আরও মুক্ত মনের পরিচয় দিলেন। রবার্টসন এর বই থেকে তিনি চারটি উৎস পেয়েছেন বলে জানালেন। যেমন,

ক. কয়লাভূমিতে ব্যবহৃত স্থানীয় পরিভাষা। যেমন Surveyor কম্পাসবাবু

খ. অপরিবর্তিতরূপে গৃহীত পরিভাষা। Dyke ডাইক

গ. সহজে উচ্চারণ করার জন্য সামান্য পরিবর্তিত শব্দ। Bolt বোল্টু

ঘ. খুব বেশি বিকৃত। Holding Clown bolt-হরিনারায়ণ বোল্টু প্রাদেশিক ভাষাতে অনুসন্ধান করতে বলেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নতুন কথা গড়া প্রবন্ধে প্রচলিত ভাষার মধ্যে পারিভাষিক শব্দটি না পেলে প্রাদেশিক ভাষাতে অনুসন্ধান করতে বলেছেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাবিজ্ঞানের কিছু পরিভাষা তৈরি করেন। যেমন, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি ইত্যাদি। সুকুমার সেন, পুণ্যশ্লোক রায়, পবিত্র সরকার প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী পরিভাষা তৈরি করেছেন। কিন্তু সবাই একমত হয়ে কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। ৯.৮.১৯৮৫ তারিখে বাংলা আকাডেমির পরিভাষা উপসমিতির সিদ্ধান্ত হল—

১. পরিভাষা যথাযথ, সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২. প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত শব্দ বিদেশি হলেও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া বর্জন না করা।

৩. পরিভাষায় গৃহীত শব্দ বাংলা ভাষা স্বভাবের বিরোধী না হয় তা দেখা।

৪. পরিভাষা নিয়ে পূর্বেকার সমস্ত উদ্যোগ, যথাযথভাবে বিবেচনা করা।

৫. প্রশাসন ও বিদ্যাচর্চার বিভিন্নক্ষেত্রে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ উপযুক্ত ব্যক্তিত্বের পরিভাষা সংকলনে পরামর্শ গ্রহণ।

৬. পরিভাষা নির্মানকালে হিন্দি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার নির্মিত পরিভাষাও প্রয়োজনে বিবেচনা করা।

সুপারিশ হিসাবে, জনমত যাচাই করার জন্য পরিভাষায় খসড়া সংসদ পত্র বা সাময়িক পত্র বা পুস্তিকার মাধ্যমে প্রচার করা। বিভিন্ন বিদ্যার প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি নিয়ে উপসমিতি তৈরি করে পরিভাষা সংকলনের কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে।

১৬.৭ অভিধান ও উচ্চারণকোষ তৈরি

বাজার চলতি অভিধানগুলিকে প্রাথমিকভাবে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করার কথা বলেন ডঃ নির্মল দাশ। বড়ো এবং ছোটো। বৃহদায়তন অভিধানগুলির মধ্যে হরিহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (২ খণ্ড) ও জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের 'বাঙলা ভাষার অভিধান' (২ খণ্ড) উল্লেখযোগ্য। আর ক্ষুদ্রায়তন অভিধান হিসাবে শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত 'সংসদ বাঙলা অভিধান' (১ম খণ্ড) উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এসব অভিধানের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তাই নতুন অভিধান রচনার কথা ডঃ নির্মল দাশ জানান। সেজন্য কতকগুলি দিক লক্ষ করার কথা তিনি বলেন। যেমন,

ক. অভিধানে নতুন নতুন শব্দকে স্থান দেওয়ার জায়গা খোলা রাখতে হবে।

খ. শব্দের সঙ্গে প্রয়োগগত এলাকা নির্দেশ করতে হবে।

গ. উচ্চারণ নির্দেশ করা দরকার।

ঘ. উদ্দেশ্য অনুসারে সংক্ষিপ্ত ও বৃহৎ উভয় প্রকার অভিধানই রচনা করতে হবে।

শব্দ, উচ্চারণ, পদবিভাগ, স্তর নির্দেশ (গ্রাম্য, কথ্য ইত্যাদি), উৎস নির্দেশ ও ব্যুৎপত্তি সহজ শব্দ, বাক্যখণ্ড ও বাক্যে প্রাথমিক অর্থনির্দেশ, উদাহরণ দিয়ে প্রয়োগ নির্দেশ, প্রতিশব্দ, প্রয়োজনে বিপরীত শব্দ, পদান্তর নির্দেশ প্রভৃতি সংহত অভিধানে দেওয়া দরকার। সুবৃহৎ অভিধানে এছাড়াও শব্দের ইতিহাস, প্রথম প্রয়োগ ও পরবর্তী পরিণাম, অর্থান্তর, তুলনামুলক পর্যালোচনা, শব্দের উচ্চারণ ও বানানের কালান্তর ব্যাপী বিবর্তন ও পরিবর্তনের পথ নির্দেশ প্রভৃতি যুক্ত হতে পারে।

বাংলা অভিধানে উপসমিতি যেসব সিদ্ধান্তে নেয় তা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

১. সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য অভিধান রচনা।

২. উচ্চারণ, উৎস, ব্যুৎপত্তি, বিশেষ শব্দের দৃষ্টান্ত, সম্ভব হলে প্রথম প্রয়োগের ইতিহাস যুক্ত করতে হবে। শব্দ চয়নের আদর্শ—ক. সাহিত্যে ব্যবহার খ. সাহিত্যে সংবাদপত্রে তার ব্যবহার এর frequency দেখতে হবে গ. ১৫ শতক থেকে শব্দ চয়ন শুরু করতে হবে। শব্দসংখ্যা আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার।

৩. বাচ্যার্থ-লক্ষ্যার্থ-সাংকেতিক এই ক্রমে অর্থ নির্দেশ করতে হবে। দরকার হলে লিঙ্গান্তর ও বিপরীত শব্দ দিতে হবে।

৪. প্রচলিত অভিধানের শব্দ ছাড়াও সাধারণ লোকের কাছ থেকে শব্দ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

শব্দার্থ অভিধান নিয়ে কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। তারপর কিশোর অভিধান, আঞ্চলিক - লৌকিক কোষ, জীবনী কোষ, সাহিত্যকোষ, তুলনামূলক ভাষা অভিধান প্রভৃতি রচনা করতে হবে।

১৬.৮ প্রশাসনের ভাষা

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রশাসনের কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের আইনটি অনুমোদিত হয়। মাঝে মাঝে সরকারি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মনে করিয়ে দেওয়া হলেও সে ব্যাপারে বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায়নি। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে মন্ত্রীসভা কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যথা—

ক. সরকারি নথিপত্রে বাংলা ভাষায় মন্তব্য লিখতে হবে।

খ. সরকারি ফর্ম, রেজিস্ট্রার ইত্যাদি বাংলা ভাষায় ছাপাতে হবে।

গ. জনসাধারণের কাছে বাংলায় চিঠি লিখতে হবে।

ঘ. নিম্ন আদালতে কাজকর্ম বাংলা ভাষায় করা দরকার।

ঙ. বাংলা ভাষায় স্টেনোগ্রাফি ও টাইপিং জ্ঞান আবশ্যিক করতে হবে।

চ. ইংরেজি স্টেনোগ্রাফার ও টাইপিষ্টদের বাংলা প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

ছ. বাংলা টাইপরাইটার কিনতে হবে।

জ. সরকারি অফিসে ফলকগুলি বাংলা ভাষায় লিখতে হবে।

প্রশাসনের কাজে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করা যেমন—ভাষাপরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তেমনি প্রশাসনের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দিলে আমাদের চারপাশের জীবনে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

কেন্দ্র ও অন্য রাজ্যের সঙ্গে সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে কিংবা বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা অবশ্য ব্যবহার করতে হবে।

১৬.৯ শিক্ষা ও মাতৃভাষা

লিখতে জানার আগে শিক্ষা ছিল মৌখিক ও শ্রুতিনির্ভর। আর তা অবশ্যই মাতৃভাষা নির্ভর। সাক্ষরতার সঙ্গে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হবে না অন্য ভাষা হবে সে প্রশ্ন জড়িত হয়। ইংরেজ শাসকদের আসার আগে যখন শাসনকাজের ভাষা ফারসি ভাষা ছিল তখন সেই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের দিকে প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইংরেজ শাসক এদেশে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটায়। কিন্তু বিষয় বা ধারণা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিখতে পারলেই তা নিজস্ব বিষয় হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রচলনের ভূমিকা গ্রহণ ভাষা পরিকল্পনার অন্তর্গত।

কিন্তু কোনো মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রচলন করলেই হবে না। প্রয়োজন শিক্ষার উপযোগী আদর্শগ্রন্থ রচনা করা। বাংলা ভাষার এরকম বই খুব কম। ফলে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রচলনের পাশাপাশি মাতৃভাষার উপযুক্ত গ্রন্থ রচনা করা এবং বাংলা ভাষায় বিদেশি বই অনুবাদ করা বিশেষ প্রয়োজন। না হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্রমাগত পিছিয়ে যাব।

১৬.১০ দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা

সারা পৃথিবীতে ইংরেজি ভাষার ব্যাপক প্রচার দেখা যায়। প্রায় সব দেশেই ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। Otto Jesperson ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জানান যে, ইংরেজির প্রসারের মূল কারণ, অন্যদেশে উপনিবেশ স্থাপন ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব। অধীনস্থ প্রজারা নিজেদের স্বার্থে ইংরেজি শিখেছে। পবিত্র সরকার জানান, যে মধ্যবিত্ত ভারতীয়ের কাছে ইংরেজি শেখার সঙ্গে চাকরি পাওয়া, উচ্চশিক্ষা লাভ করা এইসব সম্ভাবনা তৈরি হয়। তাই বাংলাভাষী লোকের কাছেও ইংরেজি ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শেখার গুরুত্ব আছে।

দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে কথা বলতে বলতে শেখার কথাই ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন। এছাড়া দরকার ইংরেজি মাতৃভাষার মতো বলতে পারেন এমন শিক্ষক। শিক্ষক ভাষাবিজ্ঞানী হল ভালো। যথেষ্ট পরিমাণে বাক্য ব্যবহার অভ্যাস করা দরকার। টেপরেকর্ডার, রেকর্ডপ্লেয়ার, ভিডিয়ো, ফিল্ম, টেলিভিশন প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা

দানের পাশাপাশি ভাষাগবেষণাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্লাসের বাইরে ভাষা শেখানো, বাড়িতে ক্যাসেট চালিয়ে শেখা, উপযুক্ত পাঠ্যবই, রেকর্ড, ক্যাসেট তৈরি করা ইত্যাদির উপর জোর দিতে হবে।

১৬.১১ বাংলা প্রাইমার রচনা

লেখাপড়া শেখার প্রথম পদক্ষেপ হল প্রাইমার। নানা সময়ে বাংলা শেখানোর জন্য প্রাইমার লেখা হয়েছে। পড়িবার বই, (তত্ত্ববোধিনী সভা ১৮৩৫), বর্ণমালা (স্কুল বুক সোসাইটি ৭ম সং ১৮৫৩), বর্ণপরিচয় (বিদ্যাসাগর ১৮৫৫), বর্ণপরীক্ষা (হীরালাল মুখোপাধ্যায়), বর্ণপরীক্ষা (নবকুমার নাথ, ১৮৭৫), বর্ণশিক্ষা (গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৮), বর্ণবোধ (চারজন একই নামে লেখেন ১৮৭৩-৭৫-এ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ১৮৭৪-৭৫ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৫ অনুগত, ১৮৭৭ রামনাথ রায়), হাসিখুশি (যোগীন্দ্রনাথ সরকার ১৮৯৮), সহজপাঠ (রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০) নিজে পড় (সুখলতা রাও ১৯৫৬), কিশলয় (পঃ বঃ সরকার, ১৯৮১) প্রভৃতি।

পবিত্র সরকার 'ভাষা-দেশ-কাল' গ্রন্থে বাংলা প্রাইমারের নানা দিক আলোচনা করেছেন। তিনি পড়া-লেখা এবং উচ্চারণ শেখানো আলাদা ভাবে এই তিনটি দিক ধরে আদর্শ প্রাইমার রচনার একটি মানদণ্ড তৈরি করেছেন। এগুলিকে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বলেছেন। যথা,

পড়তে শেখানো।

ক. লিপির সঙ্গে পরিচয়।

খ. বর্ণকে আলাদা ভাবে চেনানো।

গ. একই বর্ণের রূপভেদগুলি চেনানো।

ঘ. বর্ণ সময়ের ধারণা নিয়ে চেনানো।

উচ্চারণ শেখানো।

ক. বর্ণ ও তার উচ্চারণের সম্পর্কটি শেখানো।

খ. বাক্য ও তার স্বরভঙ্গি শেখানো।

লিখতে শেখানো

ক. কিছু সরল ডিজাইন অভ্যাস করিয়ে বর্ণগুলির চেহারা সম্পর্কে ধারণা তৈরি করানো।

খ. বর্ণ-বর্ণভেদ বারবার লিখিয়ে অভ্যাস করানো।

গ. প্রতিবর্ণের পরিমাণ, মধ্যবর্তী দূরত্ব, দুটি শব্দের মাঝখানের ফাঁক ইত্যাদি শেখানো।

ঘ. কমা, সেমিকোলন, কোলন, দাঁড়ি প্রভৃতি বিরতি চিহ্নের ব্যবহার শেখানো।

ঙ. বানান শেখানো।

এসব ছাড়াও আরও কিছু দিক দেখা দরকার বলে তিনি মনে করেছেন।

ক. প্রাইমারে শিশুর অভিজ্ঞতার সমর্থন বা বৃদ্ধির উপাদান যথেষ্ট আছে কিনা তা দেখতে হবে।

খ. বর্ণশেখানোর পদ্ধতি বর্ণানুক্রমিক, ধ্বনিমূলক, শব্দানুক্রমিক, বাক্যনুক্রমি, গাল্পিক কিম্বা প্রভৃতির মিশ্ররূপ তা দেখতে হবে।

গ. উপাদান উপকরণ শিশুর কাছে আগ্রহ তৈরি করছে কিনা তা দেখতে হবে।

ঘ. অক্ষর পরিচয় ছাড়াও অন্য কোনো লক্ষ্য আছে কিনা তা দেখতে হবে।

বলা বাহুল্য, বাংলা প্রাইমার রচনার ক্ষেত্রে বর্ণবিন্যাসের প্রধান তিনটি পদ্ধতি আছে।

একটি পদ্ধতিতে বর্ণবিন্যাস শিখিয়ে তারপর শব্দ এবং বাক্য শেখানো।

অন্য পদ্ধতিতে বাক্য ভেঙে শব্দ এবং শব্দ ভেদে বর্ণপরিচয় ঘটানো।

এবং তৃতীয় পদ্ধতিতে বর্ণ থেকে শব্দ-বাক্য এবং বাক্য থেকে সব-বর্ণ এই মিশ্ররূপ শেখানো হয়।

প্রাইমারের ক্ষেত্রে তৃতীয় পদ্ধতিটি অবলম্বন করা শ্রেয়।

প্রতিটি বর্ণ শেখানোর পর সেগুলি লিখতে শেখান যথেষ্ট প্রয়োজন।

জানা বিষয় থেকে অজানা বিষয়ের দিকে যাত্রা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে পরিচিত শব্দ ব্যবহার করে বর্ণ, শব্দ ও বাক্য শেখানো প্রয়োজন। পরিবারের লোকজন—বাড়িতে ব্যবহৃত দ্রব্যের নাম প্রভৃতি জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা প্রয়োজন। মূর্ত শব্দগুলি আরো শেখানো দরকার। এবং বর্ণের পাশে চিত্র ব্যবহার করা দরকার। বিমূর্ত শব্দ একদম শেষে শেখানো দরকার।

অনেকে মনে করেন শিক্ষামূলক বিষয় ছোটোদের শেখানো দরকার। প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক, নীতিশিক্ষামূলক বিষয়কে তাঁরা গুরুত্ব দেন। আসলে শিশুদের কৌতূহল আর ভালোবাসা না জন্মালে শিক্ষার বিষয়টি তাদের কাছে নিষ্প্রাণ মনে হবে। প্রাইমার থেকে সেই ধারণা তৈরি না হলে পরবর্তীকালে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ কমে যাবে। প্রাইমার রচনার সময় এসব দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

১৬.১২ সারাংশ

বাংলা ভাষার সংস্কার ও নানা দিক নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ভাষাবিজ্ঞানী এবং পন্ডিতবর্গ আলোচনা করেছেন। গোপাল হালদার সমস্যাগুলিকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখার কথা বলেন। লিপি, বানান, পরিভাষা ও অভিধান নিয়ে কাজকর্মের কথা তিনি বলেন। পুঁথিতে বাংলা লিপির আসল চেহারা পাওয়া যায়, ছাপার ক্ষেত্রে লিপির চেহারা নিয়ে গবেষণাও নানাবিধ হয়েছে। বানান-এর সামঞ্জস্য বিধান নিয়ে নানাবিধ প্রস্তাব নানা সময়ে দেওয়া হয়েছে। অভ্যস্ত সংস্কারের আমূল পরিবর্তন না ঘটিয়ে ছোটো ছোটো সংস্কার ঘটানোর কথা বলা হয়। পরিভাষা তৈরির ক্ষেত্রে যথাযথ, সহজ ও সংক্ষিপ্তকরণের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। জনমত যাচাই করার কথাও বলা হয়। অভিধান উচ্চারণ বোধ তৈরির ক্ষেত্রে একটি ছোটো এবং একটি সুবৃহৎ অভিধান রচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রশাসনের কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন এর পাশাপাশি সার্থক বাংলা প্রাইমার রচনার দিকে জোর দেওয়া হয়।

১৬.১৩ অনুশীলনী

১। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

ক. লিপিসংস্কার, খ. তৎসম শব্দের বানান, গ. তদ্ভব শব্দের বানান, ঘ. পরিভাষা নির্মাণের সুপারিশ

২। বাংলা ভাষা সংস্কার ও পরিকল্পনার নানা দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। বানান সমস্যা এবং তার সংস্কারের দিকগুলি নিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

৪। পরিভাষা নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করে পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন দিকগুলি দেখা দরকার বলে আপনি মনে করেন তা লিপিবদ্ধ করুন।

৫। প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব দেখিয়ে আলোচনা করুন। প্রসঙ্গাত বাংলা প্রাইমার এর বৈশিষ্ট্য কী হবে তা দেখান।

৬। বাংলা প্রাইমার রচনার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য কী কী তা আলোচনা করুন।

১৬.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

নাথ, মৃণাল, ১৯৯৯, ভাষা ও সমাজ

মুসা, মনসুর, ১৯৮৫, ভাষা পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব।

হুমায়ুন রাজীব, ২০০১, সমাজভাষাবিজ্ঞান।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬ প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার।

Rubin, J, Fishman, J. A. & Ferguson, F. E (Eds.) 1977 Language Planning Processes, The Hague : Maoton, -1-1